বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা,
সপ্তম বর্ষ সংখ্যা কার্তিক ১৪০৯

মধ্যস্বত্ব* অধিগ্রহণ ও বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তন

মোঃ মাহমুদ হাসান **

The State Acquisition and Social Change in Bangladesh

Md. Mahmud Hasan

Abstract: Social change or the change of social structure actually involves social relationships. Social relationship takes place due to many causes, one of which is production relation. With the introduction of the Permanent Settlement in 1793 in this sub-continent the pattern of the ownership of property drastically changed; the Zamindars became the owner of land, and the common people and the actual farmers did not have any right to the ownership of land. This system of land ownership contributed to the emergence of many intermediate interest classes resulting in uneven, unequal pattern of social relationship and feudal mode of production in the society. Before the departure of the British Government from India, Flaud Commission was formed to mitigate the gaps between the Zamindars and the Riyats, and following the recommendations of the Commission in 1950, the "State Acquisition and Tenancy Act" was passed by the Parliament. This act shattered the Zamindary system as well as the intermediate classes. After the independence of Bangladesh, a series of land laws was enacted, but the production relation did not improve where agrarian relation could be observed free from semi-feudal, semi-colonial culture and values. This article is an attempt to explore the process of social change, specially in terms of agrarian relation, in Bangladesh.

পটভূমিকা

বিশ্বব্যবস্থা তত্ত্বের বিখ্যাত তাত্ত্বিক ও সমাজবিজ্ঞানী ইমানুয়েল ওয়ালারস্টাইলের মতে সামাজিক কাঠামো পরিবর্তনের মূলে, কী ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায়, কী সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায়, রাষ্ট্রযন্ত্রই মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। ধনতান্ত্রিক বিশ্বে পুঁজি সঞ্চয়ন, পুঁজির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, অনুন্নত দেশ থেকে পুঁজি লুণ্ঠন, মাঝারি ও ভারী শিল্প স্থাপন এবং বহির্বিশ্বে পুঁজিবাজার সম্প্রসারণসহ ধনতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে পশ্চিমা ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রযন্ত্র প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে

* রাষ্ট্রীয় বা জমিদারী অধিগ্রহণের পরিবর্তে 'মধ্যস্বত্ব' প্রত্যয়টি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে এ জন্য যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের ফলে সৃষ্ট বহু মধ্যস্বত্বভোগী স্বার্থ ও অন্যান্য কতিপয় ভূমিকর স্বার্থ ও স্বত্ব রাষ্ট্র কর্তৃক অধিগ্রহণের ফলে বিলুপ্ত হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে এসব মধ্যস্বত্ব ও স্বার্থ বিলুপ্ত করে কৃষকশ্রেণীকে জমির মালিকানা প্রদানপূর্বক সরকার ও কৃষকের মধ্যে ভূমিসংক্রান্ত স্বার্থ বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে সম্পর্ক রচনার জন্য এ আইন প্রণয়ন করা হয়। জমিদারী তথা মধ্যস্বত্ব বিলোপই এর অন্যতম প্রধান দিক; অপরটি হলো প্রজার তথা কৃষকের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়, আমরা এ বিবেচনায় 'রাষ্ট্রীয়' শব্দের পরিবর্তে বিষয়বস্তুর সাথে সংগতিপূর্ণ 'মধ্যস্বত্ব' প্রত্যয়টি এ প্রবন্ধে ব্যবহার করেছি।

** উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

প্রণোদনা ও নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যব্যবস্থা সব সময়ই অব্যাহত রেখেছে। অপরদিকে সামন্ততান্ত্রিক কৃষিভিত্তিক সমাজকাঠামো ভেংগে খামারভিত্তিক কৃষিব্যবস্থার পত্তন, রাষ্ট্রীয় সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণমুখী সমাজতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মাণের ক্ষেত্রে সাম্যবাদী ও সমাজতান্ত্রিক কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রই প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। এ দুই ব্যবস্থার সমর্থনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নানাভাবে, নানানামে অনেক সংগঠনের জন্ম হয়েছে, তাদের ধ্যান-ধারণা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলেছে; এবং কথিত ঐ দুই বিশ্ব ব্যতীত বাকি বিশ্ব, যাকে তৃতীয় বিশ্ব বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়, আদর্শের বিশ্বাসে দোলায়িত হয়েছে। এক ধরনের অতলান্ত, অধরা ও ঐন্দ্রজালিক বাতাবরণের বিশ্বাসে শেষোক্তবিশ্বের অন্তর্গত বাংলাদেশও বাদ যায়নি সে নেকাবে ঢাকতে। কিন্তু, যা পূর্বেই উক্ত হয়েছে, বাংলাদেশের রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাজনৈতিক ক্ষমতাগোষ্ঠী, তা সরকার পরিচালনায় যুক্ত হোক বা বহির্ভূত হোক, সমাজ কাঠামো পরিবর্তনে কখনো বাস্তবসম্মত স্থায়ী ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সমর্থ হয়নি।

বিদ্যমান সমাজ কাঠামোর প্রত্যাশিত, পরিশীলিত ও পরিমার্জিত বিন্যাসের ক্ষেত্রে রক্ষণশীল রাজনৈতিক কর্তৃত্বশীল গোষ্ঠী জনগণকে আপেক্ষিক পরিবর্তনের প্রতি আকৃষ্ট করেছে বারবার, কিন্তু বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সমাজ কাঠামোর আমূল পরিবর্তনমুখীতার প্রতি তাদের অবিশ্বাস এবং ক্ষেত্র বিশেষে বিরোধীতার কারণে সমাজকাঠামোর আমূল পরিবর্তন সংঘটিত হয়নি। অন্যদিকে বিপ্লবী ধ্যান-ধারণায় তথা আমূল পরিবর্তন প্রত্যাশী ক্ষমতাহীন তথা ক্ষমতাবহির্ভূত রাজনৈতিক শ্রেণীর বিশ্বাস ও তাদের কার্যাবলী ব্যাপক জনগণকে আস্থাশীল ও আগ্রহশীল করার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে এবং তাদের কোন কোন কৌশল, যেমন শ্রেণীশত্রু খতমের নামে চরমপন্থা অবলম্বনপূর্বক সন্ত্রাসী আচরণ, গুপ্তহত্যা, জনমনে ত্রাস কায়েম ইত্যাদি সিংহভাগ জনগণ থেকে তাদের দূরে ঠেলে দিয়েছে। বাংলাদেশের সমাজকাঠামোর পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গৃহীত কার্যব্যবস্থার একটা বড় দুর্বলতা হলো, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উপাদানকে কম গুরুত্ব দিয়ে শুধু অর্থনৈতিক প্রেষণার (Economic Motivation) প্রতি বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।[১]

সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তনের উপর্যুক্ত বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিতের আলোকে ১৯৫০ সালের মধ্যস্বত্ব অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন পর্যালোচনার দাবী রাখে। একথা অনস্বীকার্য যে, সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মার্কসীয় ও ধনবাদী মূল্যবোধের বিশ্লেষণের প্রতি সমাজবিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় যেখানে প্রথমোক্ত ধারার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে উৎপাদন পদ্ধতি, উৎপাদন সম্পর্ক ও উৎপাদন শক্তির

---

১. রহমান, আসহাবুর ঃ বাংলাদেশের কৃষি কাঠামো কৃষক সমাজ ও উন্নয়ন, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, জুলাই ১৯৮৬, পৃষ্ঠা ১২৮-১২৯।

রূপান্তরের কারণে সামাজিক পরিবর্তন সূচিত হয় বলে মনে করা হয়। দ্বিতীয়োক্ত মূল্যবোধের ক্ষেত্রে, যা অনেকটা মার্কসীয় মূল্যবোধের বিরোধীতা থেকে উৎসারিত, ব্যক্তিগত সঞ্চয়, পুঁজি, আগ্রহ ও মানবীয় প্রচেষ্টাকে পবিত্র জ্ঞান করা হয় এবং ব্যক্তিগত মালিকানার উদ্যোগকে স্বাগত জানানো হয়। ব্যক্তিগত লাভালাভ, ব্যক্তিগত প্রণোদনা ও ব্যক্তিগত মালিকানার চরম উৎকর্ষ সাধনের ধারাবাহিকতায় সামাজিক সংস্কার ও পরিবর্তন সূচিত হয় বলে বিবেচনা করা হয়। এ চিন্তাধারার একজন প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্সওয়েবার। তাঁর মতে প্রোটেস্ট্যান্ট মূল্যবোধই ইউরোপে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা বিকাশের জন্য দায়ী।

সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কোন কোন সমাজবিজ্ঞানী 'এশীয় উৎপাদন' প্রত্যয় ব্যবহার করে বাংলা-ভারতের সমাজ ব্যবস্থাকে বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। কেউ কেউ একে 'জলসেচ ভিত্তিক' (Hydraulic Society) সমাজ বলে অভিহিত করেছেন। 'এশীয় উৎপাদন' প্রত্যয় ব্যবহার করার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, এখানে ধনতন্ত্র যেমন বিকশিত হয়নি, সমাজতন্ত্রও তেমনিভাবে বিকশিত হয়নি যেমনটা হয়েছিল পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্হায়। মূলত বিকশিত ভিন্নতর সমাজ ব্যবস্হাকে কার্ল মার্কস ও মার্কসপন্থীরা এশীয় উৎপাদন প্রত্যয়যোগে একে ব্যাখ্যা করেছেন। তবে জলসেচ ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্হাকে খানিকটা যুক্তিযুক্ত বলে অভিহিত করার পশ্চাতে অনেকের সমর্থন এখানে যে, নদীবেষ্টিত বাংলা-ভারতের উৎপাদন জলসেচ নির্ভর ছিল এবং গ্রামগুলো ছিল অনেকটাই স্বয়ংসম্পূর্ণ। এ গ্রাম সম্প্রদায় একমাত্র লবণ ব্যতীত আর সব কিছুই উৎপাদন করত বলে বর্ণনা করা হয়। বলা বাহুল্য, এ অঞ্চলের শিল্প-সভ্যতা তৎকালীন বিশ্বে ঈর্ষনীয় ছিল বলে ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় বাংলার বস্ত্রশিল্প মসলিনের মাধ্যমে। বাংলার বস্ত্র শিল্পীরা অতি উন্নতমানের মসলিন উৎপাদন করত যা সারা বিশ্বে রফতানি করা হত। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক সরকার বাংলা- ভারতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তারা এ দেশ থেকে সম্পদ পাচার করে নিয়ে যায় এবং এদেশের শিল্পের বাজার ধ্বংস করার জন্য তারা এ দেশীয় শিল্পকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়। ইংরেজদের নীল নকশার অংশ হিসেবে তারা এ দেশীয় মসলিন শিল্পের কারিগর ও শিল্পীদের হাত কেটে দেয় যাতে শিল্পকৌশল চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এ ষড়যন্ত্রের ফলে বিশ্বখ্যাত মসলিন শিল্প বিলুপ্ত হয়ে যায়। অপরদিকে বাংলা-ভারতকে তারা ইংল্যান্ডে প্রতিষ্ঠিত শিল্পের কাঁচামালের বাজার (Hinterland) হিসেবে গড়ে তোলে। এদেশ থেকে কাঁচামাল নিয়ে ইংল্যান্ডের শিল্প কারখানায় ব্যবহৃত হয়ে আবার শিল্পপণ্য হিসেবে তা বাংলা-ভারতে ফিরে আসত চড়া মূল্যে বিক্রি হবার জন্য।

ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী কালো থাবা যদি বাংলা-ভারতকে স্পর্শ না করত তাহলে বাংলা-ভারতের উৎপাদন ব্যবস্থা উন্নততর হতে পারত বলে প্রমাণিত হয়। স্থাপত্য শিল্পে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে উপমহাদেশীয় উৎকর্ষ বিশ্বের সর্বোৎকৃষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। তাজমহল নির্মাণের পিছনে ২২ হাজার শ্রমিকের ২২ বছর লেগেছিল এটা যেমন সত্য, তেমনি এও সত্য যে, তদানীন্তন স্থাপত্যশিল্পের শ্রেষ্ঠত্বের এ এক উজ্জ্বল নিদর্শন। মুঘল সম্রাটের ময়ূর সিংহাসন ইংল্যান্ডে যেভাবে নেয়া হলো, তা চৌর্যবৃত্তি ব্যতীত অন্য কিছু নয়; কিন্তু সভ্যতার এতসব নিদর্শন, শিল্পের এত কৌশল, সুন্দরের এত আয়োজন হন্তারকের হাতে পড়ে সবই জবাই হয়ে গেল, জগৎবিখ্যাত সভ্যতার মৃত্যুবিবরে জন্ম নিল সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার 'নীল নক্সার নব্য সংস্কৃতি'।

ঔপনিবেশিক হামলায় ও ধ্বংসে প্রায় পুরো দু'শ বছরে বাংলা-ভারত বিরান হয়ে গেল। পূর্বের জনকল্যাণমূলক স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ সমাজ ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল; চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের লীলাখেলায় কৃষক সমাজ বহু স্বার্থগোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে অসম সামাজিক সম্পর্কের পরস্পর দ্বন্দ্বমূলক অবস্থানে এসে দাঁড়িয়ে গেল, উৎপাদন ব্যবস্থায় সামন্ততান্ত্রিক উপাদান কায়েম হয়ে গেল। ভূমিদাস ব্যবস্থাও কোথাও কোথাও চালু হয়ে গেল; এক ধরনের সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতির আবহ সমাজের নাড়িমূলে প্রোথিত হয়ে গেল। পাশ্চাত্যের প্রভু-দাস সংস্কৃতির সয়লাবে বাংলা-ভারতের সাম্যবস্থামূলক সামাজিক সম্পর্ক ধ্বংস হয়ে তদস্থলে জন্ম নিল অসম ও বৈষম্যমূলক সামাজিক সম্পর্ক। এ লন্ডভন্ড সমাজ ব্যবস্থার বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে প্রথম বারের মত স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ হয়ে গেল ১৮৫৭ সালে এ দেশের দেশপ্রেমিক সিপাহীদের নেতৃত্বে (যাকে ইংরেজরা সিপাহী বিদ্রোহ বলে গালি দিয়েছে)। টিপু সুলতানের স্বাধীনতা সংগ্রাম, হাজী শরিয়তুল্লাহর সংগ্রাম, তীতুমীরের বাঁশের কেল্লা, ফরায়েজী আন্দোলন, তেভাগা আন্দোলন ইত্যাদি এ বৈষম্যমূলক সামাজিক সম্পর্ক অবসানের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়েছিল। কিন্তু রাজনৈতিক প্রয়োগ ব্যতীত আমদানী করা সাম্রাজ্যবাদী বিদেশ সংস্কৃতির সম্পর্কের অবসান ঘটানো ছিল প্রায় অসাধ্য ব্যাপার।

বাংলা-ভারতের সমাজকাঠামোর পরিবর্তনের অধ্যয়নে উপর্যুক্ত ঐতিহাসিক ঘটনাবলী অবশ্যই অনুধ্যেয় ও বিবেচ্য, যেমনটি সমাজবিজ্ঞানী জর্জ জোলস্যান ও ওয়াল্টার হির্স মনে করেনঃ

'The dynamics of society may seem like merely a pretentious way of talking about history. It is, however, history with a difference; history conceived not as narrative or chronicle, not even as a connected story or tale, but history conceived as a system, that is, as a social system with

emphasis on regularities and patterns as well as discontinuities and gaps'.[2]

যে বাংলা বৃটিশ আগমনের পূর্বে ছিল সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা, মানুষের জীবনে ছিল পরিমিত স্বাচ্ছন্দ্য ও পর্যাপ্ত স্বচ্ছলতা, সামাজিক সম্পর্ক ছিল পারস্পরিক সহনশীলতার মোড়কে আচ্ছাদিত, উৎপাদন সম্পর্ক ছিল না ধনতান্ত্রিক, না সাম্রাজ্যবাদী, কোম্পানীর শাসন এসে সে উৎপাদন সম্পর্ককে বদলে দিলো সামন্ততান্ত্রিক-ধনতান্ত্রিক অভিধায়। ১৯৪৭ ও ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পরও বাঙালির মনস্তত্ত্বে ঢুকে যাওয়া সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতি পরাজিত হয়নি বলে সাম্রাজ্যবাদের রমরমা সময়ে জমিদারের খাজনা আদায়ের জন্য প্রণীত 'পাবলিক ডিমান্ড রিকভারি এ্যাক্ট-১৯১৩' এখনো চালু রয়েছে। মধ্যস্বত্ব বিলুপ্ত হলেও এখনো বর্গাপ্রথা সগর্বে আইনী মহিমায় সমাসীন। ভূমিহীনদের সংখ্যা ক্রমাগতভাবে উদ্বেগজনকহারে বেড়েই চলেছে; আপেক্ষিক দারিদ্রই (Relative Poverty) শুধু নয়, নিরেট দারিদ্রও (Absolute Poverty) অপ্রতিহত গতিতে বেড়ে চলেছে।

মধ্যস্বত্ব অধিগ্রহণের যৌক্তিক কারণ

সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার গর্ভে জন্ম নেয়া দুঃখ-কষ্ট, ঔপনিবেশিক শোষণ ব্যবস্থা জমিদারী প্রথার নিষ্ঠুর পীড়ন ও শোষণ থেকে মুক্তি পেতে বাংলার মুক্তিকামী মানুষেরা অতীতে বহুবার সংগঠিত হয়েছে, কৃষক সংগ্রাম ও নানা আন্দোলন গড়ে তুলেছে। বিশিষ্ট সমাজচিন্তাবিদ কামাল সিদ্দিকীর ভাষায়, 'ভারবাহী পশুর মত হাশেম শেখ আর পরাণ মন্ডল শত শত বর্ষ ধরে কঠিন মাটির বুকে হাল চালিয়েছে, সোনালী ফসল কেটে জমিদার জোতদারের গোলায় তুলে দিয়েছে, আকাল দুর্ভিক্ষে ধুকে ধুকে মরেছে অথবা গ্রাম উজাড় করে শহরের বস্তিতে আশ্রয় নিয়েছে; আর কখনও কখনও জীবনধারণের গ্লানি অসহ্য হয়ে উঠলে তীতুমীরের বাঁশের কেল্লা থেকে যুদ্ধ করেছে, নীলকরদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়েছে, অথবা তেভাগা আন্দোলনে দলে দলে প্রাণ দিয়েছে'।[৩] এসব আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল শ্রমশোষণ থেকে মুক্তিলাভ ও অর্থনৈতিকভাবে সুবিচার প্রতিষ্ঠা। কৃষিভিত্তিক বাংলার সমাজ ব্যবস্থার উৎপাদন শক্তির মূলই হল বাংলার কৃষক সমাজ যারা উৎপাদনের

---

[2] Zollschan, George and Hirsh, Walter: Social Change, Explorations, Diagnoses and Conjectures, Schenkman Publishing Company, New York, 1976, page-7.

[৩] সিদ্দিকী, কামাল ঃ বাংলাদেশে ভূমি সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি. ভূমিকা পৃষ্ঠা-আট, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা সংস্থা, ঢাকা, আগষ্ট ১৯৮১।

চাকাকে সচল রেখেছিল; কিন্তু তারাই ছিল চিরবঞ্চিত। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথার প্রবর্তনের ভিতর দিয়ে বাংলার সমাজব্যবস্থায় শ্রেণী বৈষম্যের ও অসম সামাজিক সম্পর্কের সৃষ্টি করা হয় যেখানে সরকার ও জমিদার শ্রেণী কৃষককূলকে শাসন ও শোষণের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছিল। কিন্তু পরিবর্তন প্রয়াস থেমে থাকেনি, ১৯৫০ সালে মধ্যস্বত্ব (জমিদারী) অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (State Acquisition And Tenancy Act) আইনের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। বলা বাহুল্য, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও মধ্যস্বত্ব অধিগ্রহণের মাঝখানে রায়তের নিরাপত্তা ও সরকারের উপযুক্ত খাজনা পাওয়া এ দুই সমস্যার সমাধানে কিছু কিছু ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল, যেমন ১৮৫৯ সালের রাজস্ব আইন, ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৩৮ সালের ষষ্ঠ আইন।[৪]

মধ্যস্বত্ব অধিগ্রহণের সময়ে বাংলার সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থা

বাংলায় বৃটিশ রাজত্ব শুরু হওয়ার পূর্বে জমির মালিকানা রাষ্ট্র বা জমিদার নামে অভিহিত কর গ্রহীতাদের হাতে ছিল না, বরং তা ছিল চাষী শ্রেণীর হাতে ন্যস্ত। ইংল্যান্ডে প্রচলিত ভূ-স্বামী প্রথার আদলে প্রথমে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে ১৭৯৩ সালে ভূমিতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করা হয়। জমিদাররা স্বাধীন কৃষকের কাছ থেকে নয়, বরং নির্ভরশীল রায়তের কাছ থেকে খাজনা উসুল করত। এভাবে প্রাপ্ত খাজনার দশভাগের নয়ভাগই রাষ্ট্রকে দিতে হতো।[৫] চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা প্রবর্তনের দ্বিবিধ উদ্দেশ্য ছিল। এক, জমিদারী চিরস্থায়ীভাবে বন্দোবস্তের মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ের স্থায়ী ব্যবস্থা করা, অর্থাৎ ভূমি রাজস্ব আদায় ব্যবস্থাকে পাকাপোক্ত করার মাধ্যমে উপমহাদেশে বৃটিশ সরকারের অর্থনৈতিক ভিতকে মজবুত করা; এবং দুই, বাংলাদেশ তথা সমগ্র ভারত উপমহাদেশে পর্যায়ক্রমে বৃটিশের প্রতি অনুগত, বশংবদ এক শ্রেণী তৈরি করা যারা দৈহিক কাঠামোয় এ দেশীয় হলেও চিন্তা-চেতনায়, মনে-মগজে, বৃটিশ সরকারের একনিষ্ঠ সমর্থক ও এ দেশীয় এজেন্ট। এ দুই উদ্দেশ্যই পূরণ হলো চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে; কিন্তু ভূমি ব্যবস্থায় সৃষ্টি হলো অসংখ্য মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণী যা কৃষক শ্রেণীর ওপর নির্যাতনের ও শোষণের মাত্রাকে ক্রমাগত বৃদ্ধি করে চলল।

বৃটিশ কর্তৃক বন্দোবস্তকৃত জমিদারীর বাইরেও কিছু জমিদারী ব্যবস্থা বহাল ছিল যেগুলো মুঘল বাদশাগণ রাজানুগত্যের পুরস্কারস্বরূপ তাদেরকে দিয়েছিলেন। তবে এদের অধিকাংশই পরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীনে চলে আসে। এছাড়া জমিদারী

---

[৪] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১৩।

[৫] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১৩।

চিরস্থায়ী করার কারণে কোথাও কোথাও সৃষ্ট অসন্তোষ প্রশমন করার জন্য অস্থায়ীভাবে বন্দোবস্ত করা জমিদারসহ খাসমহল নামে পরিচিত কিছু রাজ সরকারের জমিদারীও ছিল। সরকারকে বাৎসরিক নির্দিষ্টহারে খাজনা দেয়ার শর্তে জমিদাররা তাদের জমিদারী চালিয়ে যেতে লাগল। এদিকে জমি চাষের সাথে জমিদারের কোন সম্পর্ক রইলো না, বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যস্বত্বভোগীদের কাছে জমির স্বত্ব সম্প্রসারিত হয়ে গেল। দেখা যেত রায়ত শ্রেণী উপরায়তদের কাছে জমি বন্দোবস্ত দিত। এভাবে উপ-সামন্ত প্রথা এতদূর বিস্তৃত হয়েছিল যে কোনো কোনো অঞ্চলে একখন্ড জমির ওপর জমিদারের নীচে পর্যায়ক্রমে ৫০ জনের স্বত্ব ছিল।[৬]

রাষ্ট্র ছাড়াও বিভিন্ন পর্যায়ের লোকেরা ভূমির সংগে জড়িত ছিল, যাদের স্বার্থও ছিল বিভিন্ন প্রকারের, যেমন জমিদার, স্বত্বাধিকারী, উচ্চশ্রেণীর রায়ত (এরা নির্দিষ্টহারে খাজনা দিত ও মালিকানা ভোগ করত), নিম্নশ্রেণীর রায়ত (এরা উপরায়ত, এদের জমির মালিকানা স্বীকৃত ছিল না), বর্গাদার (ভাগচাষী) ও কৃষি-মজুর ইত্যাদি। মোদ্দাকথা, চিরস্থায়ী জমিদারীর কারণে ভূমির সাথে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বহু মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীর সৃষ্টি হয় যারা কৃষি উৎপাদন কাঠামোয় এক সংকটাবর্তের জটিল জাল তৈরি করে। উৎপাদনের সাথে সম্পর্কহীন খাজনা আদায়কারী মধ্যস্বত্বভোগী পরগাছা শ্রেণীর শ্রেণী-চরিত্র সামন্তসমাজ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে সর্বাংশে সাহায্য করে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মারাত্মক কুফল দেখা দেয়ার পরিপ্রেক্ষিতে স্যার ফ্রান্সিস ফ্লাউডের নেতৃত্বে ভূমি রাজস্ব কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয় যার মূল কাজ ছিল ক্ষতিপূরণসহ জমিদারী ব্যবস্থা ও মধ্যস্বত্বভোগ প্রথার উচ্ছেদপূর্বক বর্গাদার প্রথার উন্নতিবিধান। বলা নিষ্প্রয়োজন, জমিদারী ব্যবস্থা শুধু ভূমি ব্যবস্থার সাথেই সম্পৃক্ত ছিল না, সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলেও তা এক জগাখিচুড়িমার্কা নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে জমিদারী প্রথা মারাত্মক কুফল বয়ে আনে। জমির সাথে অর্থাৎ উৎপাদনের সাথে জমিদারদের কোন সম্পর্ক না থাকায় তারা শুধু খাজনা আদায়ের ক্ষেত্রে মনোযোগী হয়ে পড়ে এবং অত্যধিক মাত্রায় খাজনা আদায়ের ফলে কৃষককূল শোষিত হতে থাকে। অপরদিকে দেখা যায়, কোম্পানীর সরকার এদেশে রেলপথ চালু করার ফলে আবহমানকাল থেকে চালু থাকা নদীপথ গুরুত্ব হারায় এবং ব্যাপক নদীপথ ধ্বংস হয়ে যায়। বাংলা-ভারতের জলসেচভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থা হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়লে স্বাভাবিক কারণেই বাংলায় উৎপাদন হ্রাস পায়। এতদ্ব্যতীত দুর্ভিক্ষের সময়েও জমিদারদের ভূমি রাজস্ব আদায়ে কোন ভাটা পড়েনি, বরং দুর্ভিক্ষের সময় ভূমি রাজস্ব আদায় অনেক গুণে বেড়ে যায়। এক হিসেবে দেখা যায় জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন পাশের পূর্বে সরকার জমিদারদের নিকট থেকে মাত্র ১,৭৩,৩৮,০০০/- টাকা ভূমি রাজস্ব হিসেবে আদায়

[৬] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৩-১৪।

করতেন; অন্যদিকে ঐ সময়ে জমিদারগণ প্রজাদের নিকট থেকে আদায় করতেন ৮,৪০,০০,০০০/- টাকা।[৭] যাহোক, এদেশে ইংরেজ শাসনের ফলে কৃষিভিত্তিক সমাজ কাঠামোয় সামগ্রিক অর্থে ব্যাপক বিপর্যয় নেমে আসে যা থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে জমিদারী বা মধ্যস্বত্ব উচ্ছেদের দাবী ওঠে। ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান স্বাধীন দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, তদানীন্তন ভারত উপমহাদেশের বর্তমান বাংলাদেশ নানাভাবে শোষিত ও নির্যাতিত থাকার কারণে এখানকার বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক গোষ্ঠী মনস্তাত্ত্বিকভাবে অন্যায়ের ও শোসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিল। পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পর গণদাবী ও আন্দোলনের স্রোতধারায় এবং ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের একশ্রেণীর গণমুখী নেতৃত্বের কারণে মধ্যস্বত্ব বা জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন পূর্ববঙ্গ পরিষদে পাস হয়ে যায়। এ আইন পাসের ফলে এদেশ হতে জমিদারী প্রথা অর্থাৎ ভূমির মধ্যস্বত্ব ব্যবস্থার অবসান ঘটে।

মধ্যস্বত্ব অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের বৈশিষ্ট্য

একথা মানতেই হবে যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জরাজীর্ণ বাংলার আকাশে মধ্যস্বত্ব অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন শুধু ঐ সময়ের জন্য নয়, বরং বর্তমান অবধি এক যুগান্তকারী ও ঐতিহাসিক ঘটনা।

এ আইনের মাধ্যমে প্রধানত তিনটি কাজ সম্পন্ন করা হয়। (এক) মধ্যস্বত্ব অধিগ্রহণ করা হয়, (দুই) জমিদারদেরকে তথাকথিত ক্ষতিপূরণ (?) (যারা দেড়শ বছর ধরে সাধারণ কৃষক শ্রেণীর রক্ত শোষণ করেছিল তাদেরকে আবার ক্ষতিপূরণ দেয়া কেন? এটা কি শোষণের পুরস্কারস্বরূপ?) দেয়া হয়, এবং (তিন) ভূমি ব্যবস্হার ক্ষেত্রে নতুন নিয়ম কানুন চালু করা হয়। মধ্যস্বত্ব অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫০-১৯৫১ সালের ২৮ নং আইন), এ মোট ১৫২টি ধারা আছে যার মধ্যে ১ থেকে ৭৮ ধারা জমিদারী তথা মধ্যস্বত্ব অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ সম্পর্কিত ব্যবস্থার বিন্যাস, এবং ৭৯ থেকে ১৫২ ধারা ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়ের সারাৎসার। ১৯৬৩ সালে এস এ জরিপ সমাপ্ত হওয়ায় ধারণা করা হয় যে ১-৭৮ ধারার কাজ ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হয়ে গেছে। তবে ৭৯-১৫২ ধারাসমূহ বর্তমান ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার সমাজ কাঠামোকে যেমন বদলে দিয়েছিল, মধ্যস্বত্ব ও প্রজাস্বত্ব আইনও তেমনিভাবে বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক ভিতকে পরিবর্তনের দিকে ঠেলে দেয়।

[৭] মিয়া, মোঃ আব্দুল কাদের ঃ ভূমি জরিপ ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, এ. কে. প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-১১।

এ আইনের মাধ্যমে দেড়শো বছরের পুরানো মধ্যস্বত্ব (বা জমিদারী) অধিগ্রহণ করা হলো এবং রায়তকে মালিক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে তাকে জমি ভোগদখল ও হস্তান্তরের (উত্তরাধিকারসহ) পূর্ণ অধিকার দেয়া হলো। এ আইনের সবচেয়ে বড় অবদান বা কৃতিত্ব হলো উপর্যুক্ত বিষয় দু'টি। ইংরেজ শাসনের পূর্বে বাংলা-ভারতে জমির মালিকানা স্বীকৃত ছিল যেখানে জমির উত্তরাধিকার নিশ্চিত ছিল; কিন্তু জমিদারী প্রবর্তনের ফলেই এ চিরাচরিত ব্যবস্থা ধ্বংস করা হয়েছিল।

এ আইন মোতাবেক হাট-বাজার, খনিজ সম্পদ, জলমহাল, পাথরমহাল, বালুমহাল, সরকারের নিয়ন্ত্রণে চলে এল। জমি ভাড়া দেয়া নিষিদ্ধ হলো, যদিও বর্গাপ্রথা বহাল রইলো মজুরি শ্রম দিয়ে আবাদ করার অর্থে। পরিবার প্রতি ১০০ বিঘা বা পরিবারের সদস্য প্রতি ১০ বিঘা এর মধ্যে যেটা সর্বোচ্চ হয় সেরূপে জমি রাখার বিধান করা হলো।

এছাড়া বসতবাড়ির জন্য সর্বোচ্চ ১০ বিঘা রাখার বিধান বহাল রেখে বাকি জমি সরকারের মালিকানায় রাখার ব্যবস্থা করা হলো। সরকারে বর্তানো এরূপ জমি ৩ একরের কম জমি ছিল এমন স্থায়ী কৃষকদের মাঝে বন্টন করার বিধান রাখা হলো। এখানে উল্লেখ্য যে, চা, ইক্ষু, রাবার চাষ, কফি, ফলের বাগান, কার্শিয়া পাতার বাগান, যান্ত্রিক আবাদের আওতাধীন বড় খামার ও বৃহদায়তন দুগ্ধ খামার প্রভৃতির ক্ষেত্রে বর্ণিত জমির সিলিং ব্যবস্থা অপ্রযোজ্য রাখা হলো অর্থাৎ শিথিল করা হলো।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের মালিকানাধীন খাজনা গ্রহীতা এস্টেটগুলো রাষ্ট্রের দখলভুক্ত করার ব্যবস্থা করা হলো। তবে ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য (ওয়াকফুল আওলাদ) ধর্মীয় সম্পত্তির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৩৭৫ বিঘার সিলিং রেখে সর্বসাধারণের সেবায় (ওয়াকফ্ লিল্লাহ) প্রদত্ত এস্টেটের ক্ষেত্রে কোন বিধি নিষেধ রাখা হলো না।

এ আইনে জমিদারদের ক্ষতিপূরণ দেয়ার ব্যবস্থা রাখা হলো। যাদের জমি থেকে বার্ষিক আয় ৫০০ টাকা বা তার কম ছিল তাদের আয়ের ১০ গুণ এবং যাদের আয় ১ লাখ টাকা বা তার বেশি ছিল তাদের বেলায় দ্বিগুণ হারে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা রাখা হলো। খাজনা নির্ধারণের ক্ষেত্রে জমিতে উৎপাদিত ফসলের এক-দশমাংশ নির্ধারণ করা হলো। সিলেট জেলায় নানকার নামে প্রচলিত ভূমিদাস প্রথা বাতিল করা হলো।

মধ্যস্বত্ব অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের বেশ কিছু ধারা ভূমি প্রশাসনে বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে। এর মধ্যে স্বত্বলিপি সংরক্ষণ বা হালনাগাদকরণ (১৪৩ ধারা), স্বত্বলিপি সংশোধন (১৪৪ ধারা), জোত একত্রীকরণ (১১৬ ধারা), জোত বিভক্তিকরণ (১১৭ ধারা), রাজস্ব কার্যক্রমের ওপর আপীল (১৪৭ ধারা), রিভিশন (১৪৯ ধারা) ও রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক সম্পাদিত কাজের ওপর রিভিউ (১৫০ ধারা) ইত্যাদি ধারাগুলো অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

উল্লেখ্য, এ আইন তিন পার্বত্য জেলায় প্রযোজ্য নয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দেশে জমিদারী সৃষ্টি করেছিল, পক্ষান্তরে এ আইন তার বিলুপ্তি ডেকে আনে বলে বাংলাদেশের ভূমি আইনের ইতিহাসে মধ্যস্বত্ব অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনটি একটি মাইলফলক হিসেবে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

মধ্যস্বত্ব অধিগ্রহণ আইন বাস্তবায়ন ও পরবর্তী ফলাফল পর্যালোচনা

বিনা পরিশ্রমে অর্থোপার্জন, সামাজিকভাবে প্রভাব ও ক্ষমতার স্বাদ পাওয়া জমিদার শ্রেণী মধ্যস্বত্ব অধিগ্রহণকে মনেপ্রাণে মেনে নেয়নি। বিশেষ করে তৎকালীন ক্ষমতাসীন শাষকগোষ্ঠী মুসলিম লীগের একাংশের প্রবল অনীহার কারণে এ আইন কার্যকর হতে অনেক সময় লেগে যায়। শুধু অনীহা বললে ভুল হবে, শোষক শ্রেণীর পক্ষ থেকে এ আইন যাতে দ্রুত বাস্তবায়িত না হয় সেজন্যে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করা হয়। ১৯৫৭ সালের জানুয়ারি মাসে সরকার পক্ষ হাইকোর্টে ও সুপ্রিম কোর্টে জয়ী হয়ে মধ্যস্বত্ব পাইকারী দখল করার সুযোগ লাভ করে এবং ১৯৫৮ সালের মাঝামাঝি সময়ে মধ্যস্বত্ব অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়। দেশের ৪৪৩টি বড় জমিদারী দখল করতে ৬ বছর সময় (১৯৫০-৫৬) লেগে যায়।[৮] এখানে উল্লেখ্য যে, মুসলিম লীগ সরকারের মূল পরিকল্পনা ছিল তথাকথিত 'সংক্ষিপ্ত কার্যক্রম' সমাপ্ত হলে দ্বিতীয় পর্যায়ে মধ্যস্বত্ব অধিগ্রহণের কাজ ধীরে ধীরে ১৪ বছর ধরে বাস্তবায়ন করা। কিন্তু ইতোমধ্যেই ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিজয়ী হওয়ায় ভূমিলোভী সামন্ততান্ত্রিক ক্ষমতা কাঠামোয় পরিবর্তন আসে এবং যুক্তফ্রন্ট সরকার সব মধ্যস্বত্ব স্বার্থকে দখল করতে সিদ্ধান্ত নেয়। যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় না এলে মধ্যস্বত্ব অধিগ্রহণ হয়ত কোন অন্ধকার চোরাগলিতে হারিয়ে যেত।

সামন্ততান্ত্রিক শক্তির রাষ্ট্রাচার মধ্যস্বত্ব বিলোপের পক্ষে পুরোপুরি ছিল না, কেননা বর্গাপ্রথাকে এ আইনের মাধ্যমে বিলুপ্ত করা হয়নি। বর্গাপ্রথা বিলুপ্ত না করার কারণে ভাগচাষীরা নিজস্ব স্বার্থতাড়নায় উদ্বুদ্ধ হতে পারেনি কখনোই, সেজন্যে কৃষির প্রত্যাশিত উৎপাদন অর্জন করা সম্ভব হয়নি। সিদ্দিকীর মতে, ভাগচাষকে মজুরি শ্রমের সংগে এক করে দেখে এ আইন শুধু যে পুনর্ভাড়া এবং খাজনা গ্রহণের মধ্যবর্তী স্বার্থগুলোর ওপর এক নিষেধাজ্ঞা অর্থহীন করে তুলে এমন নয় বরং উৎপাদন বিরোধী একটা পদ্ধতিকে স্থায়ীত্ব দিয়েছে।[৯]

১৯৮৪ সালের ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ (১৯৮৪ সালের ১০ নং অধ্যাদেশ) এর আগে বর্গাচাষীদের ভাগ্যের উন্নয়নের জন্য কোন আইন প্রণীত হয়নি। ১৭৯৩

---

[৮] সিদ্দিকী, কামাল, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩২।

[৯] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৩।

সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণে সৃষ্ট বহু মধ্যস্বত্বভোগীদের পারস্পরিক সম্পর্ক শোষণমূলক হওয়ার ফলে বর্গাচাষীর ঘাড়ে শোষণের চরম অংকটি পড়ে যা ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশের মাধ্যমে কিঞ্চিৎ লাঘবের চেষ্টা করা হয়। বাংলাদেশে ভূমি সংস্কারের ইতিহাসে মধ্যস্বত্ব অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ব্যাপক সদিচ্ছা ও ব্যবস্থা নিয়ে আবির্ভূত হলেও সামন্ত মানসিকতার অধিকারী ভূম্যাধিকারীগণের প্রবল অনীহা এবং ক্ষেত্রবিশেষে ব্যাপক বাধার কারণে তা পূর্ণ মাত্রায় সুফল প্রদান করতে ব্যর্থ হয়। মূল আইনে পরিবার প্রতি জমির সিলিং ১০০ বিঘা রাখা হলেও ১৯৬১ সালে (আইয়ুব খানের সামরিক শাসনামলে) তা বাড়িয়ে ৩৭৫ বিঘায় উন্নীত করা এবং অনেককে (যেখানে সম্ভব হয়েছে) সরকারিভাবে দখলকৃত জমি প্রত্যার্পণ করা হয়। দেখা যাচ্ছে মধ্যস্বত্ব অধিগ্রহণের সদিচ্ছা ও সম্ভাবনা এখানে প্রচণ্ডভাবে ধাক্কা খেল।

পাকিস্তানের স্বৈরশাসকগোষ্ঠীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, আন্দোলন ও সবশেষে রক্তক্ষয়ী ৯ মাস মুক্তিযুদ্ধের ফসল স্বাধীন বাংলাদেশের ভূমি সংস্কারের ইতিহাসে ১৯৮৪ সালের ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এ অধ্যাদেশে জমির সিলিং পূর্বের ১০০ বিঘা থেকে নামিয়ে ৬০ বিঘায় আনা হয়। এ অধ্যাদেশে বর্গাজমির ফসলের অংশ নির্ধারণ করে বলা হয় যে, ভূমির মালিক মালিকানার জন্য পাবে এক-তৃতীয়াংশ, শ্রমদানের জন্য বর্গাদার পাবে এক-তৃতীয়াংশ এবং ফসলের অবশিষ্টাংশ মালিক বা বর্গাদার বা উভয়ের মধ্যে উৎপাদনের উপকরণ সরবরাহের অনুপাতে ভাগ হয়ে যাবে। বৃটিশ আমল থেকে শুরু করে এ অধ্যাদেশের পূর্ব পর্যন্ত বর্গাচাষী ও মালিকের মধ্যে ফসল বন্টন সংক্রান্ত কোন আইন প্রণীত হয়নি। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে মালিক ও বর্গাচাষীদের মধ্যে বিরাজিত দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। তবে এটা ঠিক যে, এ ব্যবস্থার মাধ্যমে ভূমিতে আধা-সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়া হলো এবং বর্গাপ্রথা বিলুপ্ত না করে তাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করা হলো। এর ফলে কৃষি কাঠামোতে সমবায় খামারভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা চালুর যে পটভূমি ঐতিহাসিকভাবে সৃষ্টি হয়েছিল তা অপসৃত হয়ে যায় এবং এর দ্বারা পূর্বের কম উৎপাদন প্রবণতার কারণসমূহ উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যে অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত হয়ে উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হিসেবে দাঁড়িয়ে যায়। অদ্যাবধি উপর্যুক্ত ব্যবস্থাই বহাল আছে যাকে অন্য কোনভাবে রূপান্তরের ভাবনা রাজনৈতিক শক্তি এখনো পর্যন্ত দেখাতে ব্যর্থ হচ্ছে।

বাংলাদেশের উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তনের জন্য মধ্যস্বত্ব অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনে কিছু ব্যবস্থা সহায়ক হিসেবে ছিল, যেমন বৃহদাকারের খামারে চাষাবাদ। কিন্তু বৃহদাকারের খামারে চাষাবাদের প্রতি সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতার কারণে আগ্রহ তৈরি হয়নি; যা হয়েছে তাহলো যান্ত্রিক পদ্ধতির সীমিত আকারে চাষাবাদে সার

কীটনাশক প্রয়োগ। সমবায় খামার ভিত্তিক চাষাবাদের ব্যবস্থা মধ্যস্বত্ব আইনে ছিল না, আর থাকলেও তা বাস্তবায়িত হতো না, কারণ ভূমিতে বিদ্যমান কর্তৃত্বশীল গোষ্ঠী সমবায় খামার ব্যবস্থার আদর্শে আগেভাগে কোনরূপ উদ্বুদ্ধ ছিল না। তবে বৃহদাকার চাষাবাদের ব্যাপক প্রচলন করা সম্ভব হলে সমবায় খামার ভিত্তিক চাষাবাদ ব্যবস্থার প্রতি কৃষক সমাজকে উদ্বুদ্ধ করা যেত।

স্বাধীনতা উত্তর কৃষির উৎপাদনের ক্ষেত্রে সার, কীটনাশক ও ট্রাকটরের ব্যবহার যথেষ্ট বেড়ে যায়; কিন্তু হাড় বেরিয়ে যাওয়া গবাদি পশুর দ্বারা বাহিত আদিম কাঠের লাঙ্গলের ব্যবহারে কোন তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন আসেনি। জমির বিচ্ছিন্নকরণ, খন্ডিকরণ, বৃহৎ পরিবারে ভাঙ্গন ও অণু পরিবার গঠিত হওয়ার ফলে মাঠেমাঠে জমি শতধা বিভক্ত হয়ে পড়ে যা ট্রাকটর দ্বারা চাষাবাদের অনুপযোগী হয়ে যায়। তবে পাওয়ার টিলার তার জায়গা অনেক ক্ষেত্রে দখল করলেও হালের বলদের প্রতিস্থাপন তার দ্বারা সম্ভব হয়নি। পাওয়ার টিলার ব্যক্তিগত পর্যায়ে ব্যবহারের পাশাপাশি কোথাও কোথাও অন্যের জমি ভাড়ার ভিত্তিতে চাষাবাদে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রান্তিক চাষী, নিম্নবিত্ত কৃষক, মধ্যবিত্ত কৃষক শ্রেণীর পক্ষে ট্রাকটর বা পাওয়ার টিলার ব্যবহার করা ব্যয়বহুল হয়ে যাওয়ায় তা তাদের আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে; শুধু ধনী কৃষক শ্রেণী কৃষির আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছে।

বাংলাদেশের সমাজ কাঠামোর পরিবর্তনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু তা সামন্ততান্ত্রিক ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের চরিত্রকে মজবুত করেছিল এবং অনেক ধরনের ভূমিস্বত্বের বা মধ্যস্বত্বের সৃষ্টি করেছিল যা ১৯৫০ সালের মধ্যস্বত্ব অধিগ্রহণের ফলে পুরোপুরি তিরোহিত না হয়ে আধা-সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক বৈশিষ্ট্যকে জিইয়ে রাখে।

উপসংহার

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বণিকের মানদন্ড রাজদন্ডে রূপান্তর পরবর্তী বাংলা-ভারতে বৃটিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের ফলে ভূমি মালিকানায় ব্যাপক পরিবর্তনসহ অসংখ্য শোষকশ্রেণী তথা মধ্যস্বত্বভোগী (যারা মূলত অলস, অকর্মা: খাজনা আদায় ছাড়া যাদের উৎপাদন বৃদ্ধিতে কোন ভূমিকা নেই) শ্রেণীর উদ্ভব হয় এবং সমাজে এক পরগাছা শ্রেণীর বৈদেশিক সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতির জন্ম হয়। মধ্যস্বত্ব শ্রেণীর সৃষ্ট অনাচার নিরোধে পরবর্তীকালে প্রতিকার ব্যবস্থা হিসেবে বৃটিশ আমলের শেষের দিকে গঠিত ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশের আলোকে পকিস্তান আমলে ১৯৫০ সালে মধ্যস্বত্ব অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন পাশ হলেও বাস্তবায়ন পর্যায়ে দেখা গেল যে, যে সদিচ্ছা নিয়ে এ আইনের জন্ম হয়েছিল সামন্ত মানসিকতা সম্পন্ন রাজনৈতিক

(ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতাবহির্ভূতসহ) শক্তি সে সদিচ্ছাকে বহুলাংশে গলা টিপে হত্যা করে। জমির সিলিং প্রথমে ১০০ বিঘা কমিয়ে আনার প্রস্তাব করলেও এবং তা অনেকাংশে বাস্তবায়ন করলেও ১৯৬১ সালে তা বাড়িয়ে ৩৭৫ বিঘায় পুনঃনির্ধারণ করায় সরকারিভাবে ইতোপূর্বে দখলীকৃত জমি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পুনরায় ফিরিয়ে দেয়া হয়। ১৯৭২ সালে এক অধ্যাদেশ (প্রেসিডেন্টের আদেশ নং-৯৮, ১৯৭২) বলে আবাদী জমির সর্বোচ্চ সীমা ১০০ বিঘায় নামিয়ে আনা হয় এবং ১৯৮৪ সালের (১৯৮৪ সালের ১০ নং অধ্যাদেশ) ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশে পূর্বোক্ত ১০০ বিঘার স্থলে পরিবার বা ব্যক্তির জমি অর্জনের সর্বোচ্চ সীমা ৬০ বিঘায় নামিয়ে আনা হয়। এ অধ্যাদেশে দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত বর্গাপ্রথা সমস্যার কিছুটা সমাধান করা হয় ফসলের ভাগাভাগি নিরূপণের মাধ্যমে। তবে বর্গাপ্রথা, (যে সামন্ততান্ত্রিক ভূমি ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ধারণ করে আছে তাকে সমর্থন দেয়ার কারণে) বাংলাদেশের ভূমি সংস্কারের ইতিহাসে আমূল (র‌্যাডিক্যাল) ধারায় পরিবর্তন আনতে ব্যর্থ হয়, অর্থাৎ উৎপাদন ব্যবস্থায় ভূমি মালিক ও বর্গাদারের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক সম্পর্ককে পাকাপোক্ত করে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে, যার একটি বৈশিষ্ট্য হিসেবে বলা যায় ক্রমবর্ধমান ভূমিহীনতা রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মধ্যস্বত্ব অধিগ্রহণ ব্যবস্থাপত্রে বৃহদাকার খামারে উৎপাদনের প্রস্তাবনা থাকলেও সমবায় খামার ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা গুরুত্বহীন হয়ে পড়ায় এবং কৃষির আধুনিকীকরণের পর্যায়ে কীটনাশক, সার, গভীর নলকূপ, ট্রাকটর, পাওয়ার টিলার ব্যবহারের সুযোগ উচ্চবিত্ত কৃষক শ্রেণী তুলনামূলকভাবে বেশি লাভ করার কারণে নিম্নবিত্ত ও প্রান্তিক চাষীদের নাভিশ্বাস উঠেছে। অপরদিকে উচ্চবিত্ত কৃষক শ্রেণী কর্তৃক প্রান্তিক চাষীদের উৎপাদন ও শ্রম শোষণের কারণে কৃষির উৎপাদন ব্যবস্থায় আধা-পুঁজিবাদী বিশিষ্টতা বিকাশমান পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। উপর্যুক্ত আলোচনায় এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, মধ্যস্বত্ব বিলুপ্ত হলেও সামগ্রিক বিচারে এখনো সামাজিক সম্পর্ক অসম আর্থিক কাঠামোয় বিন্যস্ত আছে যা সুচিন্তিতভাবে পরিমার্জন ও পরিবর্তনের অপেক্ষায় রয়েছে।

উপর্যুক্ত আলোচনায় একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, যেমনটি ওয়ালারস্টাইনের মতে ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশে রাষ্ট্রের ভূমিকাই মুখ্য, বাংলাদেশে ভূমি সংস্কারের পথে বিদ্যমান ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক শক্তি ও সরকার সব সময় রক্ষণশীল ভূমিকা পালন করেছে এবং সে কারণে দেশের সমাজ পরিবর্তন না ধনতান্ত্রিক পথে না সামন্ততান্ত্রিক পথে অগ্রসর হয়েছে। তবে সে নিশ্চলতা ও অপরিবর্তনীয়তায় রাষ্ট্রের ভূমিকাই যে মুখ্য হয়ে দেখা দিয়েছে তার সুস্পষ্ট সমর্থন মেলে।

তথ্য নির্দেশিকা

১।	উমর, বদরুদ্দীন	ঃ	বাংলাদেশের কৃষক ও কৃষক আন্দোলন, প্রগতি প্রকাশনী, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ১৯৮৫।
২।	উমর, বদরুদ্দীন	ঃ	চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ভাদ্র ১৩৮১।
৩।	ভূইয়া, গোলাম কিবরিয়া	ঃ	বাংলার মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ১৯৯৫।
৪।	মিয়া, মোঃ আব্দুল কাদের	ঃ	ভূমি জরিপ ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, এ, কে প্রকাশনী, ঢাকা, নভেম্বর ১৯৯৫।
৫।	রহমান, আসহাবুর	ঃ	বাংলাদেশের কৃষি কাঠামো কৃষক সমাজ ও উন্নয়ন, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, জুলাই ১৯৮৬।
৬।	সিদ্দিকী, কামাল	ঃ	বাংলাদেশে ভূমি সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা সংস্থা, ঢাকা, আগস্ট ১৯৮১।
৭।	সিদ্দিকী, কামাল	ঃ	বাংলাদেশের গ্রামীণ দারিদ্র স্বরূপ ও সমাধান, ডানা প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫।
৮।	হক, কাজী এবাদুল	ঃ	ভূমি আইন ও ভূমি ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০২।
৯।	Alamgir, Muhiuddin Khan (Edited by)	:	Land Reform in Bangladesh, Centre for Social Studies, Dhaka, September 1981.
১০।	Choudhury, Lutful Haq	:	Social Change and Development Administration in South Asia, National Institute

			of Public Administration, Dhaka 1978.
১১।	Chowdhury, Anwarullah	:	Agrarian Social Relations & Development in Bangladesh, Oxford & IBH Publishing Co., New Delhi, 1982.
১২।	Eashvaraiah, P.	:	Political Dimension of Land Reforms in India, Ashish Publishing House, New Delhi, 1985.
১৩।	Hossain, A M Mozammel	:	Rural Development at the Cross Roads in Bangladesh. Prottasha Prokashan, Dhaka, February 1993.
১৪।	Jahangir, B.K.	:	Rural Society, Power Structure and Class Practice, Centre for Social Studies, Dhaka, 1982.
১৫।	Khan, I Shamsul	:	Political Culture, Political Parties and the Democratic
	Islam, S. Aminul		Transition in Bangladesh, Academic Publishers, Dhaka
	Haque, M. Imdadul		1996.
১৬।	Nisbet, Robert A	:	Social Change & History, Oxford University Press, New York, 1969.
১৭।	Pandey, Dr. M.P.	:	Land Records and Agrarian Situation in Bihar, Naya Prokash, Calcutta, April 1980.
১৮।	Sen, Rangalal	:	Political Elites in Bangladesh, The University Press Limited, Dhaka, April 1986.
১৯।	Sharma, Rajendra. K	:	Social Change & Social Control, Atlantic Publishers & Distributors, New Delhi, 1997.
২০।	Siddiqui, Kamal	:	Land Reforms and Land
	Hossain, Imam		Management in Bangladesh

	Islam, Zahirul Chowdhury, Nazmul Islam, Momen Abul		and West Bengal, The University Press Limited, Dhaka, 1988.
২১।	Zollschan, George K Hirsch, Walter (edited)	:	Social Change : Explorations, Diagnoses & Conjectures, Schenkman Publishing Company, New York 1976.